যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

Date: 13.03.2016 Page 13

ধানের ডিএনএ গবেষণায় সাফল্য

নয়া সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা

কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন

প্রকৃতি ক্রমেই বিরূপ আকার ধারণ করছে। ক্রমপরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৭৩টি ইনব্রিড ও চারটি হাইব্রিডসহ মোট ৭৭টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ৮টি লবণাক্ততা সহনশীল, ৫টি খরা সহিষ্ণু, ২টি জলমগ্নতা সহিষ্ণু, ২টি ঠাণ্ডা সহনশীল, পাঁচটি সরু ও সুগন্ধি এবং ৪টি জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত। সাম্প্রতিক সময়ে ইরির বিজ্ঞানীদের ধানের জিন বিন্যাস উন্মোচন বা জেনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন দেশের ধান গবেষণার এই সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আলোচিত খবরটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট বা ইরির বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮৯টি দেশের প্রায় তিন হাজার প্রজাতির ধানের জিন বিন্যাস উন্মোচন বা জেনোম সিকোয়েন্স উদ্ভাবন ও উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। যা গেল মাসে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। আশার কথা এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের ১৮৩টি ধানের জাত। শিগগিরই কৃষকরা ধানের জিনোম সিকোয়েন্স প্রযুক্তির সুবিধা হাতে পাবেন বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণকারী শস্যটির বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে একটি সবুজ বিপ্লবের দুয়ার খুলে দিতে পারে এই আবিষ্কার। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এটি ধান উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

জীববিজ্ঞানে জীবের জেনোম (ইংরেজি : Genome) বলতে সব বংশগতিক তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায়, যা সেটির ডিএনএতে সংকেতাবদ্ধ থাকে। জিনোমে জিন এবং জাংক ডিএনএ দুই-ই থাকে। ১৯২০ সালে জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হান্স ভিংকলার জিন ও ক্রোমোজোম শব্দ দুটির অংশবিশেষ জিনোম শব্দটি উদ্ভাবন করেন। জেনোম সিকোয়েন্স হলো কোষের সম্পূর্ণ ডিএনএ বিন্যাসের ক্রম। জিনোম যত দীর্ঘ হবে, তার ধারণ করা তথ্যের পরিমাণও তত বেশি হবে। জীব দেহে বহুসংখ্যক কোষ থাকে। প্রতিটি কোষ সেই জীবের বিকাশ এবং গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বহন করে। এসব নির্দেশনার সমন্বয়ই হলো জিনোম যা ডিএনএ কিংবা আরএনএ দিয়ে গঠিত।

ধান বিজ্ঞানীরা বলছেন, ডিএনএ সিকোয়েন্স প্রযুক্তি ছাড়া যেখানে একটি জাত উদ্ভাবন করতে ১২ থেকে ১৫ বছর সময় লাগত সেখানে এই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই কৃষকদের হাতে উন্নত প্রজাতির ধান পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। আর এ কারণেই প্রকল্পটিতে কর্মরত বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এ ঘটনা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সূচনা করবে।

প্রথমদিকে ভিন্ন ভিন্ন চাষপদ্ধতি প্রয়োগ করে ধানের ফলন বাড়ানো হতো। গত শতাব্দীতে উচ্চফলনশীল বা অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা করে 'ক্রস ব্রিডিং' পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। তবে কোন জিনগুলো এ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা আগে জানা যায়নি, তাই সঠিক বৈশিষ্ট্য অনুমান করতে গিয়েই অনেক সময় শ্রম ব্যয় হতো। বর্তমানে মোলিকুলার জেনেটিক্সের কল্যাণে কোন জিন কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা দ্রুতই জানা সম্ভব।

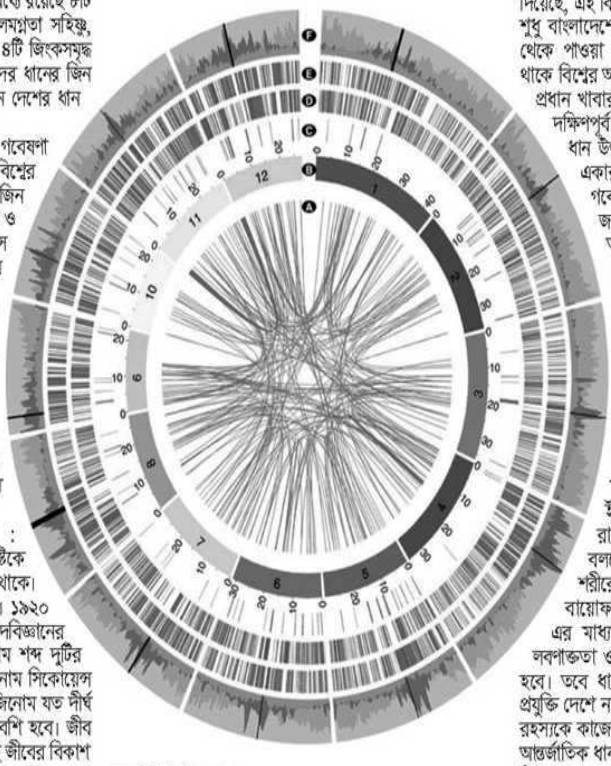

এছাড়া বর্তমানে প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃত্রিমভাবে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে সেখানে একটি নির্দিষ্ট জাতের সহনশীলতা যাচাই করা হয় যা একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই সময় সাপেক্ষ ব্যাপারটি আরো সংক্ষিপ্ত সময়ে করাই ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি) বিজ্ঞানীদের তিন হাজারের বেশি গুরুত্বপূর্ণ জাতের ধানের ডিএনএ বা জিনোম সিকোয়েন্স নির্ণয় করার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে আর্থিক সহায়তা করেছে চায়নিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, চায়নিজ মিনিস্ট্রি অব সায়েন্স এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। এই প্রকল্পের দাতারাও মনে করেন, এত ব্যাপক পরিমাণে তথ্য উন্মোচিত হওয়ায় প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল উচ্চফলনশীল প্রজাতির ধান চাষ শুরু করা যাবে। এখন ধান চাষিরা আরো দ্রুত উৎপাদন পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার শুরু করতে পারবেন। এছাড়া নির্দিষ্ট পোকামাকড় এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন প্রজাতিও আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এই বিস্তারিত ডিএনএ তথ্য হাতে পাওয়ায়।

শুধু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের প্রধান আহার নয়, ধান থেকে পাওয়া চালকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ। বিশ্বের শতকরা ৬০ ভাগ লোকের প্রধান খাবার চাল বা চাল থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্য। আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রধান খাদ্য ভাত। বিশ্বের ৯০ ভাগ ধান উৎপাদন ও ব্যবহার হয়ে থাকে এশিয়া অঞ্চলে। একারণে বলা হয়, রাইস ইজ লাইফ ইন এশিয়া। গবেষণা বলছে, বিশ্বের ১৬ কোটি হেক্টর ধানি জমিতে বর্তমানে চাল উৎপাদন হয় ৪৭ কোটি টন। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের যে জনসংখ্যা হবে তার চাহিদা পূরণ করতে লাগবে আরো ২৫ ভাগ বাড়তি উৎপাদন। কিন্তু প্রতিনিয়ত কমছে চাষের জমি। আর জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিঘাত তো আছেই। তাহলে উপায় কী? এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ইরি) বিজ্ঞানী ও প্রাণ রসায়নবিদ ড. কেনেথ ম্যাকক্যালি মনে করেন, ডিএনএ বা জেনোম সিকোয়েন্সের মতো প্রযুক্তি যেসব দেশের মানুষের প্রধান খাবার ভাত তাদের জন্য বড় ধরনের সাফল্য বয়ে আনবে।

ইরির জেনোম সিকোয়েন্স উদ্ভাবক দলের সদস্য ও রাশিয়ান বিজ্ঞানী নিকোলাই আলেকসানড্রাইভ বলছেন, এই আবিষ্কারের মাধ্যমে শস্যে মানুষের শরীরের চাহিদামাফিক বিভিন্ন পুষ্টিগুণ সংযোজন বা বায়োফর্টিফিকেশন করা অধিকতর সহজ হবে। এছাড়া এর মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ, পোকামাকড়, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও ঠাণ্ডা সহনশীল জাত উদ্ভাবন আরো ত্বরান্বিত হবে। তবে ধানের জিন বিন্যাসকে কাজে লাগানোর কোনো প্রযুক্তি দেশে না থাকায় গবেষকরা নতুন জাত আবিষ্কারে জীবন রহস্যকে কাজে লাগাতে পারছেন না।

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটর (ইরি) বিজ্ঞানীরা বলছেন, ডিএনএ বা জেনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন যদিও বিশ্বব্যাপী ধান উৎপাদক দেশগুলোয় ব্যাপক আশা জাগিয়েছে তথাপি তারা এটিকে ধান উৎপাদনের সব সমস্যার সমাধানের ম্যাজিক মনে করছেন না। তাদের মতে, এই বিষয়ে আরো বিস্তর গবেষণা ও অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে।

লেখক : উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর
Smmomin80@gmail.com